ম্যাসেজ

আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া

মিজানুর রহমান আজহারি

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত, যাঁর অপার করুণায় সকল ভালো কাজ পূর্ণতা পায়। দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি সত্যের বাণী সর্বত্র পৌঁছে দিতে আমাদের আহ্বান করেছেন। ২০২১ সালের বইমেলায় 'ম্যাসেজ : আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া' শিরোনামে প্রকাশিত বইটি বাংলা ভাষায় আমার প্রথম কাজ। নিজেকে বাংলা সাহিত্য-দুনিয়ায় যুক্ত করতে পেরে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ। জ্ঞান-দুনিয়ার দুর্বল ছাত্র। প্রতি মুহূর্তে নিত্য-নতুন কিছু জানার চেষ্টা করছি। সত্যের অনুপম ছোঁয়ায় নিজেকে ঋদ্ধ করার অবিরত এক সংগ্রামে আছি। তীর পেরিয়ে জ্ঞান-সমুদ্রের যত গভীরে প্রবেশ করছি, নিজেকে তত দুর্বল, অসহায়, অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষুদ্র হিসেবে আবিষ্কার করছি। রবের দুনিয়া কত বড়ো, তাঁর কত নিয়ামতে ডুবে আছি আমরা! পৃথিবীর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের মণি-মুক্তা, রত্ন! কটা ভাঁজেই আর বিচরণ করা যায়!

নিজের সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও উম্মাহর তরুণদের নিয়ে কেন জানি পেরেশানিতে ভুগি। একুশ শতকের তারুণ্য কী এক মরীচিকার পেছনে ছুটছে! এই প্রজন্মেরই একজন হয়ে খুব করে তাদের মানসপটকে বোঝার চেষ্টা করি। তাদের লাইফস্টাইল, চিন্তাধারা ও কর্মৎতপরতা বেশ বুঝতে পারি। তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, কথার টোন, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানকে উপলব্ধি করতে পারি। মূলত, আমার ক্ষুদ্র কর্মতৎপরতা এই তরুণদের ঘিরেই। তাদের জন্য ভাবি, বলি, লিখি, কন্টেন্ট তৈরি করি। কারণ, এই প্রজন্মকে যদি সঠিক পরিবহনে তুলে দেওয়া যায়, তাহলে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছবেই। ভুল গাড়িতে উঠিয়ে হা-হুতাশ করে কী লাভ!

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কুরআনের ম্যাসেজ পৌঁছে দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল রাব্বুল আলামিনের দয়ায়। একজন দাঈ হিসেবে সাধারণত কথা বলাটাই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা। গত সাত বছরের দাওয়াতি অভিযাত্রায় অনেক শ্রোতা আমার লিখিত বইয়ের আবেদন করেছেন। আমি জেনেছি—শোনার পাশাপাশি শ্রোতাদের বড়ো একটা অংশ পড়তে ভালোবাসেন। ইন্টেলেকচুয়াল সার্কেলে বই ও সাহিত্যের একটা আলাদা আবেদন আছে। সাহিত্যাঙ্গনে একজন দাঈ চাইলেই কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারেন।

দাওয়াহর সাহিত্যিক প্রেজেন্টেশনও বেশ কার্যকর ও টেকসই। লেখনী মানেই স্থায়ী রেকর্ড—এই ভাবনা থেকেই লেখালিখির আগ্রহটা তৈরি হয়।

এই গ্রন্থে একেবারে ঐতিহাসিক ও এক্সক্লুসিভ কোনো তথ্য হয়তো পাবেন না; এ আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা। বলতে পারেন, কুরআনের কর্মী হিসেবে সাহিত্য-জগতে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা এই গ্রন্থ। সারা দেশে বিভিন্ন সময়ে আমি সুনির্দিষ্ট কিছু পয়েন্টে আলোচনা করেছি, গ্রন্থের প্রতিটি লেখায় সেসব আলোচনার নোটই প্রাথমিক সোর্স। বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি, লেখার চেয়ে বলা অনেক সহজ।

বইটিতে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি, সাহাবিদের বক্তব্য, সালাফদের কথা, বিভিন্ন শিক্ষণীয় ঘটনা, ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক স্কলারদের রেফারেন্সের পাশাপাশি আমার নিজস্ব একান্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। সাহিত্য-দুনিয়ায় বই মানেই যে শব্দের মারপ্যাঁচে ভারী ভারী কথা, এই গ্রন্থকে সেখান থেকে খানিকটা দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। রাশভারী কথামালা পরিহার করে সাধারণ মানুষের ভাষায় লেখাগুলো সাজানোর একটা প্রয়াস এখানে আছে। সকল ধর্ম, বয়স, শ্রেণি-পেশার পাঠক নিজেদের সাথে বইটিকে কানেক্ট করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

নতুন ধারার প্রতিশ্রুতিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স’-কে পাশে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। পুরো গার্ডিয়ান টিম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। গ্রন্থটিকে পাঠকদের সামনে স্মার্টলি উপস্থাপন করতে বেশ কিছু তরুণ দিন-রাত শ্রম দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করছি।

মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নই। এই বইটিতে কোনো ভুল থাকবে না—এমন দাবি করার দুঃসাহস করছি না। মানবিক দুর্বলতার কারণে বিশেষ কোনো টাইপিং মিসটেক অথবা তথ্যগত কোনো অসংগতি আপনাদের চোখে পড়লে দয়া করে আমাদের জানাবেন; পরবর্তী সংস্করণে সেটা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য, মূল তাৎপর্য, স্পিরিট ও মধ্যমপন্থার শিক্ষা তুলে ধরতে বইটি কিছুটা হলেও অবদান রাখবে বলে আশা করছি। ‘ম্যাসেজ’ বইটিতে কিছু বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আধুনিক মননে দ্বীনের ছোঁয়া লাগাতে বইটিকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমিন।

মিজানুর রহমান আজহারি
৩০ মার্চ, ২০২১

সূচিপত্র

কুরআনের মা	১১
মুমিনের হাতিয়ার	২৯
কুরআনিক শিষ্টাচার	৪৮
উমর দারাজ দিল	৮০
ডাবল স্ট্যান্ডার্ড	১০৩
উসরি ইউসরা : কষ্টের সাথে স্বস্তি	১৩২
রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন	১৫৬
শাশ্বত জীবনবিধান	১৭৩
স্মার্ট প্যারেন্টিং	২০১
মসজিদ : মুসলিম উম্মাহর নিউক্লিয়াস	২৩০
ঐশী বরকতের চাবি	২৬০
বিদায় বেলা	২৮০

কুরআনের মা

সূরা ফাতিহা পবিত্র কালামুল্লাহ মাজিদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বোধনী বক্তব্য (Maiden Speech), একটি সার্থক মানপত্র, একটি প্রার্থনা, একটি শ্রেষ্ঠ সারাংশ এবং একটি প্রতিষেধক। অসংখ্য গুণে গুণান্বিত এই ছোট্ট সূরাটি কুরআনের প্রথম সূরা। এই সূরা দিয়েই কুরআনের সূচনা। আর 'ফাতিহা' শব্দের আক্ষরিক অর্থই হলো—শুরু বা সূচনা। এই সূরাকে 'ফাতিহাতুল কিতাব' বা কিতাবের ভূমিকা হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এ সূরার মধ্য দিয়েই খুলে যায় কুরআনের বিস্ময়কর জগতের দ্বার! এই সূরার পথ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়েই কুরআনের মহিমান্বিত রূপ আমাদের গোচরে আসে।

সূরা ফাতিহা মূলত একটি প্রার্থনা; যা মানুষের জীবনের পথ ও পাথেয় বর্ণনা করে। এই সূরার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মাদিকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রার্থনা করার পদ্ধতি। এই সূরায় অঙ্কিত হয়েছে মানবকুলের জন্য সহজ-সরল ও সঠিক জীবন-পথের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এ সূরার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে কুরআনের সামষ্টিক মহিমান্বিত রূপ, বর্ণিত হয়েছে তার সারমর্ম। বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এই সূরায়। মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল মিলে যেমন একটি পরিপূর্ণ উদ্ভিদ হয়, তেমনি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের সমন্বয়ে সূরা ফাতিহা পরিপূর্ণতা লাভ করছে।

এই রব শব্দের ছয়টি অর্থ রয়েছে—

- اَلْمَالِكُ আল মালিক : যিনি সমস্ত কিছুর মালিক।
- اَلسَّيِّدُ আস-সায়্যিদ : যিনি সবকিছুর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন।
- اَلْمُرَبِّيْ আল মুরাব্বি : যিনি সমস্ত কিছুর বৃদ্ধি ও পরিপক্বতা (Growth and Maturity) নিশ্চিত করেন।
- اَلْمُرْشِدُ আল মুরশিদ : যিনি সবকিছুর পথ দেখান।
- اَلْقَيِّمُ আল কাইয়্যিম : যিনি সবকিছুর অস্তিত্ব নিশ্চিত করেন।
- اَلْمُنْعِمُ আল মুনয়িম : যিনি সমস্ত কিছু উপহার দান করেন।

রব শব্দের পুরো অর্থ বুঝতে এই ছয়টি অর্থই আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এই অর্থগুলো সামনে রাখলে বুঝতে পারব—আমরা যে রবের প্রশংসা করি, তিনি কে।

রব শব্দের একটা অর্থ—মালিক। এজন্য কোনো বস্তুর মালিককে আরবি পরিভাষায় 'রব্বুল মাল' এবং বাড়ির মালিককে 'রব্বুদ-দ্বার' বলা হয়। মানুষ যাকে নিজের রিজিকদাতা ও প্রতিপালক বলে মনে করে, যার নিকট হতে মান-সম্মান, উন্নতি ও শান্তি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে থাকে, মানুষ যাকে প্রভু, মনিব ও মালিকরূপে অবহিত করে এবং বাস্তবজীবনে যার আনুগত্য ও আদেশ পালন করে চলে, প্রকৃতার্থে তিনিই রব, প্রতিপালক। আমাদের যার যখন যেটা যতটুকু দরকার, তাকে তখন সেটা না চাইতেই যিনি ব্যবস্থা করে দেন, তিনিই হলেন রব।

আমরা মায়ের গর্ভে থাকাকালীন আল্লাহর কাছে কিছুই চাইতে পারিনি; তবুও আল্লাহ তায়ালা সেখানে আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। এরপর যখন ভূমিষ্ঠ হলাম, 'ওয়া' 'ওয়া' শব্দে কান্না করা ছাড়া তখনও কিছু বলতে পারিনি। তবুও দয়াময় আল্লাহ মায়ের বুকের ভেতর আমাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মায়ের বুকের দুধ খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করতাম। এই সময় আমাদের দাঁতের কোনো দরকার ছিল না। ফলে আল্লাহ আমাদের দাঁত দেননি। এবার মানবশিশু কিছুটা বড়ো হতে লাগল। এখন ভাত, মাছ, মাংস এগুলো চিবোতে হবে; অর্থাৎ দাঁতের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়টিতে আল্লাহ চাওয়ার আগেই ধীরে ধীরে মুখের মধ্যে দাঁত সেট করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

মুমিনের হাতিয়ার

'দুআ' মাত্র দুই অক্ষরের একটি শব্দ। কিন্তু শব্দটির ক্ষমতার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি পরিমাপ করা সত্যিই বড্ড কঠিন। এ যেন মালিক ও দাসের মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার সেতু নির্মাণকারী এক কারিগর। একজন ক্ষুদ্র দাস আরশে আজিমের মালিকের কাছে মিনতি করছে, ভিক্ষা মাঙছে আর মনিব উজার করে সব দিয়ে দিচ্ছেন—এ যেন ওয়ান টু ওয়ান বোঝাপড়া। কী দারুণ একটা ব্যাপার! সুবহানাল্লাহ।

দুআর মাধ্যমে আমরা মূলত আল্লাহর প্রতিটি নাম ও বিশেষত্বের স্বীকৃতি দিই। আমরা স্বীকৃতি দিই, তিনি আমাদের স্রষ্টা আর আমরা তাঁর অনুগত দাস। আমাদের লালন-পালন, নিয়ন্ত্রণ সবকিছুই তাঁর হাতে। আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তিনি শুনছেন, দেখছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। সবকিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। দুআ মানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ, উপাস্য হিসেবে তাঁর একক অধিকারের স্বীকৃতি।

দুআ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ উপহার। দুআ করা এবং দুআ চাওয়া দুটোই সুন্নাহ। দুআ একটি মহৎ ইবাদতও বটে। বিশ্বনবি বলেন—

> 'আল্লাহর দৃষ্টিতে দুআর চেয়ে মহৎ কিছু নেই।' (সহিহ বুখারি : ৫৩৯২)

দুআ একটা আর্ট বা শিল্প। একে রপ্ত করতে হয়, আত্মস্থ করতে হয়। সব কাজের মধ্যে যেমন ফার্স্ট-ক্লাস, সেকেন্ড-ক্লাস, থার্ড-ক্লাস আছে, তেমনি দুআর মধ্যেও ফার্স্ট-ক্লাস, সেকেন্ড-ক্লাস, থার্ড-ক্লাস আছে। কেউ ফার্স্ট-ক্লাস দুআ করলে আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করে নেন। আর থার্ড-ক্লাস দুআ করলে সেই দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এমন অনেক দুআকারী আছে—যাদের দুআয় কোনো আবেগ ও ভাবাবেগ থাকে না। এ যেন রোবটিক দুআ—ফাঁপা, নিষ্প্রাণ; দুআ করার জন্য দুআ। এ রকম দুআ আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না।

দুআ করতে হবে আবেগ দিয়ে, যে আবেগ চোখের জলের বাঁধ ভেঙে দেবে। হৃদয়কে করবে নরম, উর্বর। বান্দার চোখের পানি আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। অনুতপ্ত বান্দার

চোখের পানি নাকের ডগা বেয়ে মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তায়ালা তার দুআ কবুল করে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। দয়ার নবি বলেন—

> ‘দুই ধরনের ফোঁটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এক. অনুতপ্ত বান্দার চোখের অশ্রুর ফোঁটা; দুই. জিহাদের ময়দানে শহিদের রক্তের ফোঁটা।’ (জামে আত-তিরমিজি : ১৬৬৯)

দুআর শক্তি

দুআ মুমিনের অসাধারণ এক হাতিয়ার। দুনিয়ার সবকিছুর কারিশমা যেখানে শেষ, দুআর কারিশমা সেখান থেকেই শুরু। সব ক্ষমতা যেখানে অকার্যকর, দুআর ক্ষমতা সেখানেই কার্যকর। দুআর মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর কাছে ধরনা দেওয়া হয়। আর আল্লাহর দরবারে ‘না’ বলতে কিছু নেই; আছে শুধু ‘হ্যাঁ’। দুআর অসাধারণ কিছু শক্তি জেনে নেওয়া যাক।

দুআ ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার : মানুষের তাকদিরে সাধারণত কোনো পরিবর্তন হয় না। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ আমাদের তাকদির লিখে রেখেছেন, কিন্তু দুআর বদৌলতে তাকদিরও পরিবর্তন হতে পারে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে—‘Everything is pre-written, but by supplication its re-written.’

বিশ্বনবি ﷺ বলেন—

> ‘দুআর বদৌলতে তাকদিরের কিছু অংশ বদলে যায়।’ (জামে তিরমিজি : ২১৩৯)

আমরা প্রায় সময় শুনি, অমুক রোগীর ক্যানসার; বেশিদিন বাঁচবে না। বাংলাদেশের সেরা ডাক্তার ঘোষণা দিয়েছেন, বাঁচলে সর্বোচ্চ ছয় মাস। কিন্তু দেখা যায়, সেই লোকটি আরও দশ বছর বেঁচে থাকে। এটা কীভাবে সম্ভব? কেবল দুআর বরকতেই সম্ভব হয়।

কুরআনিক শিষ্টাচার

একবার বনু তামিম গোত্রের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের এক লোক এসে নবিজিকে ডাকা শুরু করল—‘ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া মুহাম্মাদ’ বলে। নবিজিকে এভাবে আদবহীনভাবে ডাকাডাকি আল্লাহ পছন্দ করেননি। তাই আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এই আয়াতটি নাজিল করলেন। (মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪৪৮)

বন্ধুর বাড়িতে গেলে মানুষ বন্ধুকে যেভাবে নাম ধরে ডাকে, নবি ﷺ-এর বাড়িতে এসেও তারা একইভাবে তাঁকে ডাকতে শুরু করেছিল। এর বিপরীতে তাদের কী করা উচিত ছিল, তা আল্লাহ পরের আয়াতে বলে দিয়েছেন—

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

> 'তুমি নিজেই বাইরে বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, সেটাই তাদের জন্য শ্রেয় হতো। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা হুজুরাত : ০৫)

আমরাও মাঝে মাঝে কারও বাড়িতে গেলে শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ডাকাডাকি করি, তাড়াহুড়ো করি, অস্থিরতা প্রকাশ করি—'আরে! কতক্ষণ ধরে বসে আছি! আসে না ক্যান?' হতে পারে—আমি যখন তার বাসায় এসেছি, তখন তার ঘুমের সময়। মনে রাখতে হবে, যার বাড়িতে গেলাম, সে-ও তো একজন মানুষ। তারও তো অনেক সুবিধা-অসুবিধা থাকতে পারে, তারও তো পেরেশানি আছে, তাই না? সুতরাং আমরা যে কারও বাসায় যাই না কেন, একটু ধৈর্য ধরব। তাকে সুন্দরভাবে উপস্থিত হওয়ার সময় দেবো। সবচেয়ে ভালো হয়—কোথাও যাওয়ার আগে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া। তার ব্যস্ততা আছে কি না জেনে নেওয়া। মোবাইলে কথা বলার ক্ষেত্রেও এই শিষ্টাচারগুলো স্মরণ রাখা উচিত। কারও বিশ্রাম, ঘুম, নামাজ, এমনকী 'অফিস টাইমে' ফোন দেওয়া উচিত না। কাউকে ফোন দেওয়ার পূর্বে এসব চিন্তা করা দরকার। আমরা অনেকেই একবার ফোন রিসিভ না করলে একের পর এক ফোন দিতেই থাকি। এমনও তো হতে পারে, ব্যক্তিটি নামাজে আছে কিংবা ওয়াশরুমে আছে। তাই একবার ফোন রিসিভ না করলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত।

এক্ষেত্রে স্ত্রীকে যদি স্বামীর ফোন রিসিভ করতেই হয়, তাহলে কথা বলার ক্ষেত্রে স্ত্রী অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। ফোন ধরে শুধু স্বামীর ব্যস্ততার কারণটা বলে কেটে দেবেন। অতিরিক্ত কথা একদম বলবেন না। কারণ, ফোনের এপাশ থেকে আপনি, ওপাশ থেকে পরপুরুষ আর মাঝখানে থাকে শয়তান!

উমর দারাজ দিল

উমর ﵁-এর 'ফিরাসাহ' বা দিব্যদৃষ্টি

একবার উমর ﵁ মসজিদে নববিতে জুমার খুতবা দেওয়ার সময় হুট করে বলে উঠলেন—'ইয়া সারিয়াতাল জাবাল' অর্থাৎ 'হে সারিয়া! পাহাড় অভিমুখে ছোটো।' এই কথা তাঁর বক্তব্যের আগের বাক্যের সাথেও মিল নেই, পরের বাক্যের সাথেও মিল নেই। নামাজের পর সবাই জিজ্ঞেস করলেন—'আমিরুল মুমিনিন! হুট করে কেন আপনি এই কথাটি বললেন?'

উমর ﵁ বললেন—'খুতবা দেওয়ার সময় দেখলাম, মুসলিম বাহিনী প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। মুসলিম বাহিনীর ডানে পাহাড়, বামে উপত্যকা। তাঁরা পাহাড়ের দিকে না গিয়ে উপত্যকার দিকে রওয়ানা হলো; অথচ ওদিকে শত্রুরা ওত পেতে আছে। তাই তাঁদের সাবধান করতে বললাম—উপত্যকার দিকে নয়; পাহাড়ের দিকে যাও।' এ কথা শুনে অনেকেই অবাক হলেন। উমর ﵁ আছেন মদিনায়। মদিনায় থেকে কীভাবে পারস্যে নির্দেশ করছেন? তখনকার সময়ে তো মোবাইল ছিল না, ছিল না আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা। তিনি কীভাবে এ কথা বললেন?

কিছুদিন পর ওই বাহিনী মদিনায় ফিরে এলো। কয়েকজন তাঁদের জিজ্ঞেস করল—'অমুক দিন কি আপনারা এমন কোনো আওয়াজ শুনেছিলেন?' তাঁরা বললেন—'হ্যাঁ, আমরা আমিরুল মুমিনিনের আওয়াজ শুনেছিলাম। এর ফলে আল্লাহর রহমতে আমরা শত্রুর হাতে কচুকাটা হওয়া থেকে বেঁচে গেছি।' (*আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৩৫ পৃষ্ঠা)

উমর ﵁-এর ব্যক্তিত্ব

উমর ﵁ এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন, তিনি যেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, শয়তান সেই রাস্তার আশেপাশেও থাকত না। মদিনার মুনাফিকরা তাঁকে যমের মতো ভয় পেত।

বাচ্চারা রাতে খেতে না চাইলে আমরা তাদের বিড়াল, কুকুর, বাঘ অথবা ভূতের ভয় দেখাই। আর মদিনার মায়েরা বাচ্চাদের ভয় দেখাতে বলত—'খাও খাও, ওই যে উমর আসছেন, উমর!'

ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

চরিত্রের বেশ কিছু ধরন দৃশ্যমান। ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক চরিত্র দিয়েই মানবসত্তাকে মূল্যায়ন করা হয়। তবে দুনিয়াতে সবচেয়ে ঘৃণিত চরিত্র—নিফাকি তথা কপটতা। একজন মুনাফিকের চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দুনিয়ায় আর কেউ নেই। মুনাফিক মানেই দ্বিমুখী চরিত্রের বর্ণচোরা লোক। প্রতারক শ্রেণির এই লোকগুলো সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ঘোরতর শত্রু।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বদাই এদের উপস্থিতি ছিল। স্থান, কাল ও সময় ভেদে এদের চেহারা বদলালেও চরিত্র এক ও অভিন্ন। ওপরে বন্ধু সেজে ভেতরে ক্ষতি সাধনে হীন কর্মেই এরা লিপ্ত থাকে সব সময়। ইসলামের ইতিহাসেও এমন গোপন শত্রু ছিল, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। এদের মুখে মধু আর অন্তরে বিষ। এরা গিরগিটির মতো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। ফলে এদের চেনা বড়ো দায়।

'মুনাফিক' আরবি শব্দ। ইংরেজিতে বলে Hypocrite। উৎপত্তিগতভাবে মুনাফিক শব্দটি 'আন-নিফাক' শব্দ হতে এসেছে। আন-নিফাক শব্দটি এসেছে 'নাফাকা' শব্দ হতে। নাফাকা শব্দের বাংলা অর্থ সুরঙ্গ (Tunnel)। সাধারণত প্রত্যেক সুরঙ্গের দুই প্রান্তে দুটি মুখ থাকে। তেমনই মুনাফিকও হলো দুই মুখওয়ালা বা দ্বিমুখী নীতিওয়ালা ব্যক্তি (Two Faced Personality)। মুনাফিকরা দুই দলের কাছে গিয়ে দুই রকম কথা বলে। দুই দলের কাছে দুই রকম চেহারা নিয়ে হাজির হয়। যখন যার কাছে যায়, তখন তার পক্ষে কথা বলে। মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমে তাদের এই Double Standard-এর ব্যাপারে বলেছেন—

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ۙ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ-

‘তারা যখন ঈমানদার লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে—“আমরা ঈমান এনেছি।” কিন্তু শয়তানের সাথে একান্তে সাক্ষাতে বলে—“মূলত আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। আর তাদের (ঈমানদারদের) সঙ্গে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র।”’ (সূরা বাকারা : ১৪)

দ্বীন পালনের ক্ষেত্রেও মুনাফিকরা নিজেদের সুবিধামতো নীতি পরিবর্তন করে। নিজের জন্য যা সুবিধাজনক, শুধু সেগুলোই বেছে বেছে গ্রহণ করে। আবার নিজেদের স্বার্থে আঘাত এলে পাশ কাটিয়ে চলে। একই জিনিস নিজের বেলায় সত্য ও সঠিক, কিন্তু অন্যের বেলায় ভুল ও বেআইনি—এটাই হচ্ছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা দুমুখো নীতি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে মুনাফিকদের ব্যাপারে মুসলিমদের সাবধান করতে অসংখ্য আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا-

‘তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেই দিকে আসো এবং রাসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন এ মুনাফিকদের দেখবেন—তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্তত করছে এবং পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।’ (সূরা নিসা : ৬৬)

মুনাফিককে দুই মুখওয়ালা বলার হেতু হচ্ছে—মরুভূমিতে একটি প্রাণী আছে, যার নাম ‘আন-নাফিকা’ (النافقاء)। এই প্রাণিটি তার ঘরে দুটি দরজা রাখে, যেন শত্রু একটি দরজা দিয়ে আক্রমণ চালালে বিকল্প দরজা দিয়ে সে পালাতে পারে। এই চরিত্রের প্রাণীর সাথে মিল থাকায় দুমুখো লোকদের বলা হয় মুনাফিক। এখান থেকে মুনাফিকের দ্বৈত চরিত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। মুনাফিক অর্থ দুই চরিত্র বা দ্বিমুখী নীতিওয়ালা মানুষ।